উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক আয়োজিত

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট

উন্নয়ন সমন্বয়ের পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয়

১৭ জুন ২০২৩

খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ কনফারেন্স হল, উন্নয়ন সমন্বয়

প্রেক্ষাপট

করোনা মহামারিজনিত অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতি যে টালমাটাল অবস্থার মধ্যে পড়েছে তার রেশ পড়েছে বাংলাদেশেও। ফলে আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান কমানো, ঋণ ব্যবস্থাপনা, জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজস্ব আদায় বা ড়ানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রক্ষা করা, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, নীতি-সুদহার নির্ধারণ, এবং সর্বোপরি মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে দেশের নাগরিকদের (বিশেষত তুলনামূলক কম আয়ের পরিবারগুলোকে) সুরক্ষা দেয়ার মতো বহুমুখী চ্যালেঞ্জ এ মূহুর্তে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সে বিচারে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় সামষ্টিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। তাই এই প্রেক্ষাপটে **আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট চলতি মাসের শুরুতে প্রস্তাবিত হয়েছে তাকে একটি আপতকালিন তথা সঙ্কট মোকাবিলার বাজেট হিসেবেই দেখতে হবে**। তবে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য যে ধরনের সংস্কার অপরিহার্য তারও বেশ খানিকটা দিক-নির্দেশনা এই বাজেটে রয়েছে বললে ভুল হবে না।

এই পর্যালোচনা পত্রে প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের প্রধানত তিনটি দিকের ওপর নজর দেয়া হয়েছে, এগুলো হলো- ০১) বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবনার ব্যবচ্ছেদ, ০২) রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য অর্জনের চ্যালেঞ্জ, এবং ০৩) সামাজিক সুরক্ষাসহ সামাজিক খাতে বরাদ্দের যৌক্তিকতা। পাশাপাশি বাজেট প্রস্তাবে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় এবং কিছু সুনির্দিষ্ট নীতি-পরামর্শ এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

বাজেট ২০২৩-২৪ এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জ

প্রস্তাবিত বাজেটে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে ধরে রাখার লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার কালে যখন দেশের মানুষ মূল্যস্ফীতির কারণে হিমশিম খাচ্ছেন তখন মূল্যস্ফীতি এই মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তা নিশ্চয়ই একটি বড় অর্জন হবে। সত্যি বলতে আসছে অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কতো হলো বা না হলো তার চেয়ে মূল্যস্ফীতি কতোটা নিয়ন্ত্রণ করা গেল- সেদিকেই বেশি নীতি-মনযোগ কাম্য। তবে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে ধরে রাখার লক্ষ্য অর্জন আদৌ সম্ভব কি-না তা নিয়ে ভাবার সুযোগ আছে। কারণ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জানাচ্ছে **চলতি অর্থবছরের প্রথম এগারোটি মাসে কখনোই মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের নিচে ছিলো না**, আর মে মাসে গড় মূল্য স্ফীতি তো প্রায় দুই অঙ্কের কাছে ঠেকেছে (৯.৯৪ শতাংশ)। আর গত এপ্রিল পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৮.৬৪ শতাংশ। নিঃসন্দেহে এই অর্থবছরের মূল্যস্ফীতির যে লক্ষ্য (৭.৫ শতাংশ) তার থেকে তা বেশ বেশি। আর পাশের দেশ ভারতের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি দুই অঙ্কের ওপরে ছিল সর্বশেষ ২০২০-১১ অর্থবছরে (১০.৯২ শতাংশ)।

বাজেট বক্তৃতায় মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসার মহৎ ঘোষণা থাকলেও কি কৌশলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট পথনকশা ওই অর্থে দৃশ্যমান হয়নি। তবে অর্থমন্ত্রণালয়ের মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবৃতিতে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে 'মধ্যমেয়াদে সতর্ক রাজস্ব নীতি' অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে মুদ্রানীতিকেও সঙ্কোচনমূলক রাখার কথাটি বাজেট বক্তৃতায় আসেনি। নিশ্চয়েই আসন্ন মুদ্রানীতিতে সে কথাটি আসবে। পাশাপাশি ভর্তুকি যৌক্তিকীকরণ ও সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠান সমূহের মানোন্নয়নের কথাও বলা হয়েছে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবৃতিতে। সর্বোপরি মুদ্রাবাজারে স্থিতিশীলতা আনতে একক মুদ্রা বিনিময় হার চালু করার কথাও শোনা যাচ্ছে (এটি নির্ভর করবে জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালের মুদ্রানীতির ওপর)। এই প্রস্তাবনাগুলো যদি বাস্তবায়ন করা যায় তাতে মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতির কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমে আসতে শুরু করেছে (যেমন: জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭০-৭৫ ডলারে নেমে এসেছে যা প্রায় করোনা মহামারি আসার আগের দামের সমান)। তবে এর প্রভাবে রাতারাতি বাংলাদেশে পণ্যমূল্য পরিস্থিতির উন্নতি আশা করা ঠিক হবে না। কেননা ডলারের বিপরীতে টাকার যে অবমূল্যায়ন হয়েছে তার জেরে আমাদের আমদানি খরচ আগের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আপাতত অসম্ভবই মনে হচ্ছে।

[১] উন্নয়ন সমন্বয়ের আয়োজনে জাতীয় পর্যায়ের অর্থনীতিবিদ এবং উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে বাজেট পর্যালোচনা গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই পর্যালচোনা পত্রটি প্রস্তুত করেছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ড. আতিউর রহমানের নেতৃত্বে এই পর্যালোচনাটি প্রস্তুত করেছেন উন্নয়ন সমন্বয়ের বাজেট বিশ্লেষক দলের সদস্যরা।

সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার

(২০২২-২৩ অর্থবছরের হিসাবটি প্রথম ১১ মাসের, অর্থাৎ মে ২০২৩ সময়কাল পর্যন্ত)

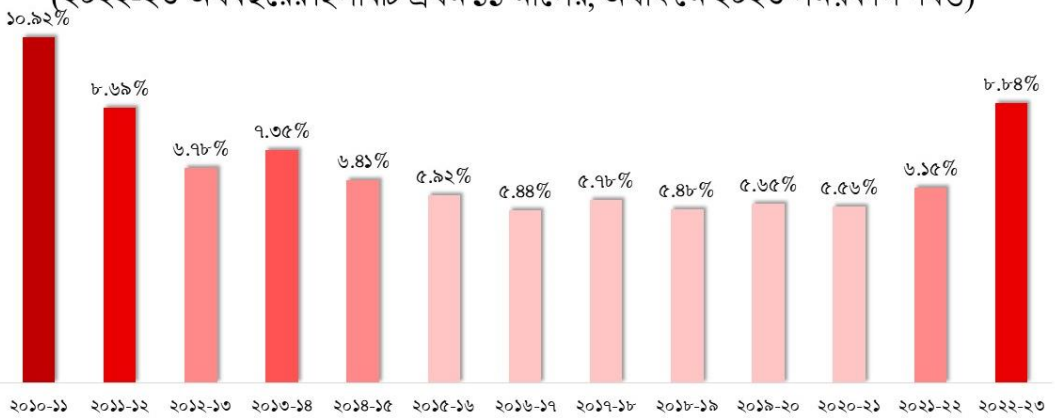

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের মে মাস পর্যন্ত কোন মাসেই মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের নিচে নামেনি। এপ্রিল ২০২৩-এ মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৯৪ শতাংশ।

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

এসবের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারী ঋণের কারণেও মূল্যস্ফীতির চাপ বহাল থাকবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ২ লক্ষ ৫৮ হাজার কোটি টাকার যে বাজেট ঘাটতি আছে তার ৫১ শতাংশই সরকার অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ করবে। সরকার যদি এ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে নেয় তাতেও বাজারে টাকার সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে মূল্যস্ফীতির চাপ অব্যাহত থাকতে পারে (চলতি বছরে সরকারকে ঋণ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে ৭০ হাজার কোটি টাকা ছাপাতে হয়েছে)। অন্যদিকে সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে ব্যক্তিখাতের জন্য ঋণের সরবরাহে ভাটা পড়ার ভয় আছে। ঋণ সরবরাহ সঙ্কুচিত হলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হবে, তাতে বাজারে পণ্য সরবরাহ কমবে। তাতেও পণ্যমূল্য বাড়ন্ত হবে। তবে এই মূহুর্তে মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে আনার জন্য ঋণ সঙ্কোচনের কোনো বিকল্পও দেখা যাচ্ছে না। **কাজেই আসছে অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে ধরে রাখাকে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখতে হবে।**

মূল্যস্ফীতির লক্ষ্য কতোটা অর্জন করা যাবে সেটা নিয়ে হয়তো আলোচনা/পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে। তবে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় মূল্যস্ফীতি সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। আর সমকালীন মূল্যস্ফীতি যাতে দীর্ঘমেয়াদে চেপে না বসে সে জন্য মূল্যস্ফীতির আশঙ্কাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মুদ্রানীতিকে যথার্থ সিগনাল বা ইঙ্গিত দিতেই হবে। সেজন্য নীতি সুদ হার ও বাজার-নির্ভর সুদের হারের দিকেই বাংলাদেশ ব্যাংককে হাঁটতে হবে। আশা করা যায় সে পথেই হাঁটবে বাংলাদেশ ব্যাংক। 'সুদ করিডোর' চালু করা গেলে তা হবে মন্দের ভালো।

এই সময়টায় নাগরিকদের মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে রক্ষা দেয়ার জন্য বাজেটে কি পদক্ষেপ ঘোষিত হলো সেটিও দেখার বিষয়। করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩.৫ লক্ষ করায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি পাবেন অনেক নাগরিক। একইভাবে আসন্ন অর্থবছরে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়েও আরও ৯ শতাংশ বাড়িয়ে ৮৪ হাজার কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে। ভর্তুকিতে কাটছাটের চাপ থাকার পরও জনজীবনে স্বস্তি আনতে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি জনস্বার্থের প্রতি সংবেদনশীলতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা যায়।

মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে নাগরিকদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য আরও কিছু উদ্যোগের কথা ভাবা যায়। যেমন: আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের কারণে অনেক ভোগ্যপণ্য ও ইনপুট আমদানির খরচ বেড়ে গেছে। এই বাড়তি খরচের চাপ সামাল দিতে রেগুলেটরি শুল্কসহ কিছু কিছু আমদানি শুল্ক কমানোর কথা ভেবে দেখা উচিৎ। আশার কথা এই যে, মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিবৃতিতে আমদানির ওপর কড়াকড়ি কমিয়ে আনার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তাতে সরবরাহ পরিস্থিতির খানিকটা হলেও উন্নতি হবে। এমনটি হলে মূল্যস্ফীতিতে কিছুটা অন্তত ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

রাজস্ব আহরণে 'কোয়ান্টাম জাম্প'-এর প্রত্যাশা

বাংলাদেশের জিডিপির আকার যে হারে বেড়েছে তার তুলনায় রাজস্ব আহরণে গতি আসছে না- এ কথাটি বেশ কয়েক বছর ধরেই দেশের অর্থনীতিবিদেরা সামনে আনছেন। সাম্প্রতিক দশক জুড়ে দেশের জিডিপির শতাংশ হিসেবে আহরিত রাজস্বের অনুপাত ১০ শতাংশের আশেপাশেই আটকে আছে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১০ শতাংশের কম)।

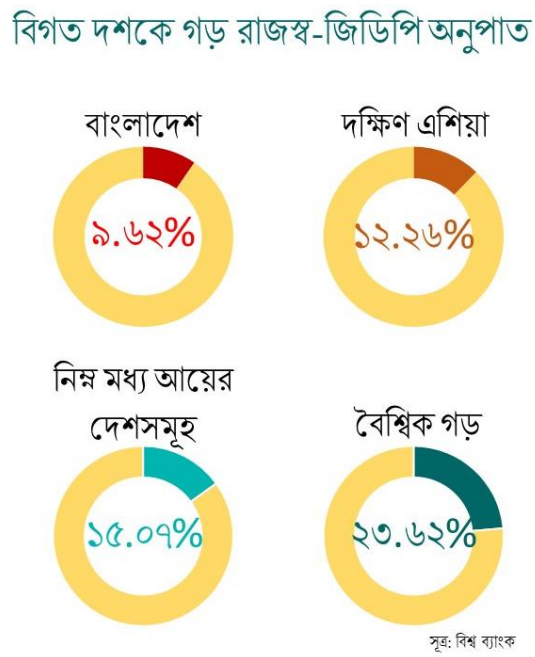

বিশ্ব ব্যাংকের তথ্য মতে ২০১১ থেকে ২০২১ সময়কালে বাংলাদেশের গড় রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৯.৬২ শতাংশ (২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ৯.৯৯ শতাংশ) । অথচ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্য এই গড় ১২.২৬ শতাংশ এবং নিম্ন মধ্য আয়শ্রেণীতে পড়ে এমন দেশগুলোর জন্য তা ১৫.০৭ শতাংশ। সে বিচারেই **বাংলাদেশের রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশ করার উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানিয়ে আসছেন বিশেষজ্ঞরা**। সর্বশেষ আইএমএফ যে সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছে সেখানেও রাজস্ব আয় বিশেষত আহরিত করের পরিমাণ বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে আসছে অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার যতোটা বেড়েছে সে তুলনায় রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে বেশি (বাজেট বেড়েছে ১৫.৩৩ শতাংশ, রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা বেড়েছে ১৫.৪৭ শতাংশ)। বাজেটে ৫ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে, যার মধ্যে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা (৮৬ শতাংশ) আহরণ করবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনবিআর। রাজস্ব আহরণকে বলশালী করার এই প্রস্তাবনাকে স্বাগত জানাতেই হবে। তবে সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব প্রাপ্তির যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত যতোটা রাজস্ব আহরণ করা সম্ভব হয় তার ব্যবধান বিবেচনায় নিলে এই লক্ষ্যামাত্রাকে বেশ চ্যালেঞ্জিংই বলতে হয়।

সাম্প্রতিক অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বাজেটে রাজস্ব আহরণের যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয় প্রকৃত পক্ষে রাজস্ব আহরিত হয় তার তুলনায় ১৪ থেকে ৩০ শতাংশ কম। এনবিআর-এর তথ্য মতে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাদের লক্ষ্যমাত্রার ৬১ শতাংশ অর্জন করতে পেরেছে। তবে সাধারণত অর্থবছরের শেষ দিকে রাজস্ব আহরণের গতি বাড়ে।

গত এক দশকে গড় রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত এবং সাম্প্রতিক অর্থবছরগুলোতে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে যতোটা সাফল্য অর্জিত হয়েছে- তার বিচারে বলা যায় **রাজস্ব আদায়ে সরকার একটি 'কোয়ান্টাম্প জাম্প' করতে চাচ্ছে**। কাগজে-কলমের হিসেবে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। কেননা সরকারি হিসেব অনুসারে টিআইএন-ধারি করদাতার সংখ্যা ৮৮ লক্ষ হলেও এদের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করছেন ৩২ লক্ষ (প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ টিআইএন-ধারি রিটার্ন দাখিল করছেন না)। এই রিটার্ন দাখিল না করা টিআইএন-ধারিরা আসছে বছরে রিটার্ন দাখিল করলে রাজস্ব আয়ে প্রত্যাশিত উল্লম্ফন সম্ভব হতেই পারে। তবে বাস্তবের প্রশ্ন হলো- করদাতাদের রিটার্ন দাখিলে উৎসাহিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে কি-না। আশার কথা- মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন

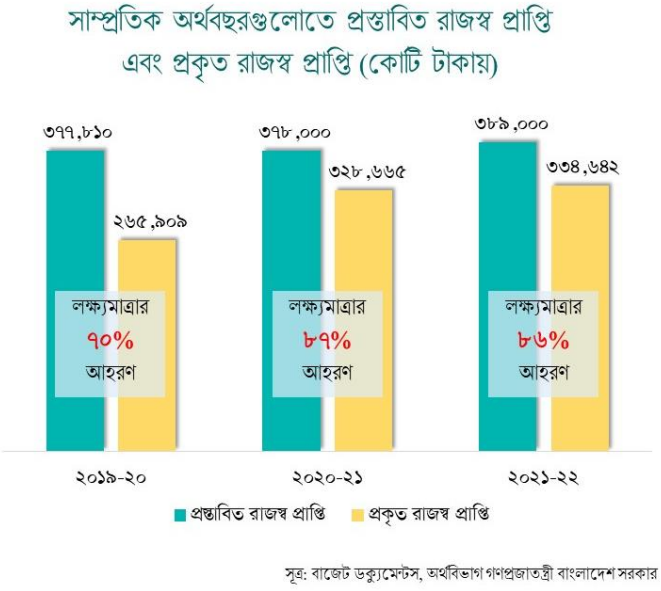

আয়কর রিটার্নধারির সংখ্যা বাড়ানোর দিকেই সরকারের মনযোগ থাকবে। এ জন্য ট্যাক্স রিটার্ন প্রিপেয়ার বা টিআরপি বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব রয়েছে। এতে টিআইএনধারিদের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করার প্রবণতা বাড়ার পাশাপাশি নতুন করদাতাদেরও করজালে অন্তর্ভুক্ত হতে উৎসাহিত করা যাবে বলে আশা করা যায়। পাশাপাশি রাজস্ব আয়ের বড় অংশ যেহেতু মূল্য সংযোজন কর, ভ্যাট থেকে আসে তাই সরকার ভ্যাটের আওতাও বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে। 'অপ্রয়োজনীয় বিদেশ ভ্রমণে'র ক্ষেত্রে ভ্রমণ করের হার বাড়ানোর প্রস্তাব, সোনার বারের শুল্ক দ্বিগুণ করা, একাধিক গাড়ির মালিকদের জন্য পরিবেশ সারচার্জ ইত্যাদি উদ্যোগগুলোও রাজস্ব আয় বাড়াতে সহায়ক হবে বলে মনে হচ্ছে।

তবে সরকার রাজস্ব আহরণকে বলশালী করতে যে পরিকল্পনা নিয়েই এগুতে যাক, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য এনবিআর-এর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। আর এই লক্ষ্যে মনযোগ দিতে হবে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশনের দিকে। টিনধারি সকলের জন্য ন্যূনতম ২,০০০ টাকা করের বিষয়টিই বিবেচনা করা যাক। করযোগ্য নয় এমন আয়কারি ব্যক্তিদেরও করের আওতায় আনাটি যৌক্তিক কি-না - সেটি আলাদা তর্ক। এ নিয়ে নৈতিকতার প্রশ্নও ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তবে এনবিআর যদি চায় বিপুল সংখ্যক নাগরিক এই ন্যূনতম কর দিক- তাহলে ডিজিটালি কর আহরণ ছাড়া সাফল্য আসবে না।

এনবিআর জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেইজের সঙ্গে সংযুক্ত করে একটি অ্যাপ তৈরি করে সেই অ্যাপের মাধ্যমে এই কর (অথবা সার্ভিস চার্জ) প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারলে তা সকল পক্ষের জন্যেই সুফল বয়ে আনবে। তা না হলে এ নিয়ে অযথা বিড়ম্বনা বা হয়রানি বাড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এজন্য কর সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত 'আর্থিক সাক্ষরতা' তথা উপযুক্ত তথ্য অভিযান গড়ে তোলা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত হয়রানির আশঙ্কা দূর করা না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত করসীমার নীচের মানুষের ওপর এই বাড়তি চাপ দেয়াটা কতোটা যৌক্তিক হবে তা ভেবে দেখা দরকার।

প্রস্তাবিত বাজেটের কিছু কর প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে বলে মনে হয়েছে। বিদ্যমান বাস্তবতায় ধনীদের সম্পদের ওপর করের সীমা ৩ কোটি টাকা থেকে ৪ কোটিতে উন্নিত না করলেও চলতো। বিদেশ যাত্রায় বাড়তি করারোপ বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সহায়ক হতে পারে। তবে বিদেশগামী শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের এর আওতার বাইরে রাখা উচিৎ।

অনেকগুলো **কর প্রস্তাব দেশীয় শিল্পের বিকাশে বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে হচ্ছে**। যেমন: কাঁচ শিল্প ও সুইচ/সকেট প্রস্তুতকারকদের দেয়া করছাড় দেশীয় উৎপাদকদের সুবিধা দিবে। আবার, আমদানিকৃত লো-ক্যাপাসিটি বৈদ্যুতিক প্যানেলের ওপর কাস্টম ডিউটি ১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করায় যারা দেশে এসব প্যানেল তৈরি করেন তারা সুফল পাবেন। কম্পিউটার ও আইসিটি পণ্যে ভ্যাট ছাড় জুন ২০২৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কিছু গার্হস্থ্য ইলেক্ট্রনিক পণ্যেও এমন ছাড় দেয়া হয়েছে।

সার্বিক বিচারে কর প্রস্তাবগুলোকে বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীল মনে হয়েছে। করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩.৫ লক্ষ করায় মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে কিছুটা স্বস্তি পাবেন অনেক নাগরিক। একাধিক গাড়ির মালিকদের জন্য বাড়তি কর, টেক্সটাইল বর্জ্য ব্যবসার ভ্যাট উঠিয়ে দেয়া, এবং সৌরশক্তিচালিত পানিশোধন প্ল্যান্টে অগ্রিম কর প্রত্যাহারের মতো সিদ্ধান্তগুলো পরিবেশবান্ধব উন্নয়নকে বেগবান করবে। বিভিন্ন ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াত দেয়ার ফলে আউট-অফ-পকেট স্বাস্থ্য ব্যয় কিছুটা কমতে পারে।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক চাপের সময়ে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ

অর্থনৈতিক অস্থিরতার এ সময়ে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বিশেষ মনযোগের দাবিদার। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ চলতি বছরের সংশোধিত বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকার বেশি করা হয়েছে। কিন্তু বাজেটের শতাংশ হিসেবে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ কমে গেছে। ১৭.৮১ শতাংশ থেকে কমে ১৬.৫৮ শতাংশ হয়েছে। তবে এর মধ্যে উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়িত প্রকল্পের বরাদ্দও যুক্ত করা হয়েছে। ওই বরাদ্দগুলো বাদ দিলে বাজেটে সামাজিক সুরক্ষার অংশ কমে দাঁড়ায় ১৫.১৯ শতাংশ। এছাড়াও সামাজিক সুরক্ষার আওতায় বিভিন্ন নগদ কর্মসূচিতে যে ৪৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা থেকে ৬৩ শতাংশই চলে যাবে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারিদের পেনশনে। **সামাজিক সুরক্ষা থেকে পেনশন আর উন্নয়ন বাজেটের অংশ বাদ দিলে মোট বাজেটে এ খাতের অংশ হয় ১১.৬ শতাংশ**। এবারের বাজেট প্রস্তাবে নতুন কোন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয়নি। বিদ্যমান বাস্তবতায় নগরাঞ্চলের কম আয়ের পরিবারগুলোর জন্য পাইলট ভিত্তিতে হলেও নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন বাজেট থেকে অর্থায়িত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে বরাদ্দের বন্টন

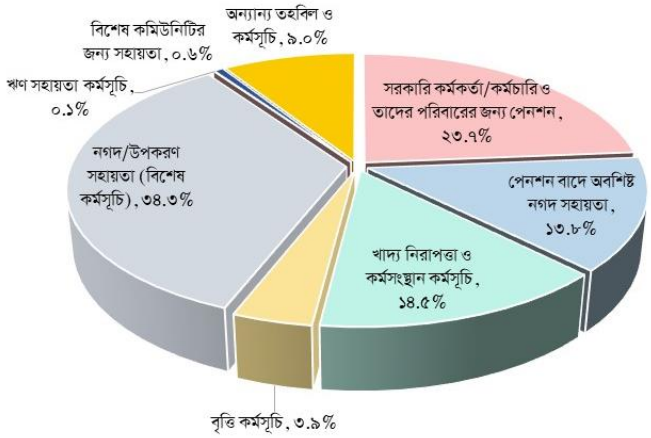

সূত্র: বাজেট ডকুমেন্টস, অর্থবিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দের ক্ষেত্রে এই কমতিগুলো কিছুটা হলেও পুষিয়ে নেয়া যাবে কৃষিতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে ধারবাহিকতা রক্ষা করায়। কৃষিতে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ৪৪ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশ। সার-জ্বালানির দামবৃদ্ধিতে চলতি বছরে কৃষি ভর্তুকি বাড়িয়ে ২৬ হাজার কোটি টাকা করতে হয়েছে। বিশ্ব বাজারে উপকরণের দাম হ্রাসের বিবেচনায় আসছে বছরে কৃষি ভর্তুকি ১৭ হাজার কোটি টাকার বেশি রাখা হয়েছে। ২ কোটি কৃষককে স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে সহায়তা দেয়ার উদ্যোগটিও প্রশংসার দাবিদার। এতে লিকেজ কমবে এবং দক্ষতা বাড়বে। এছাড়াও কৃষি উপকরণ আমদানিতে করছাড়ের সুফল ভোগ করবেন মৎস্য, ডেইরি, ও পোল্ট্রি উদ্যোক্তারা। **কৃষির প্রতি নীতিমনযোগের ফলে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বলশালী থাকবে এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলো সঙ্কটকালে সুরক্ষা পাবে**। যারা অর্থনৈতিক চাপে পড়ে শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছেন তাদের জন্য কৃষির এই বরাদ্দ খানিকটা স্বস্তির কারণ হতে পারে। কেননা কৃষি উৎপাদন বাড়লে অকৃষি খাতেও কাজ কর্ম বাড়ে।

বাংলাদেশে মোট স্বাস্থ্য ব্যয় (Total Health Expenditure)-এ বিভিন্ন অংশীজনের অবদান

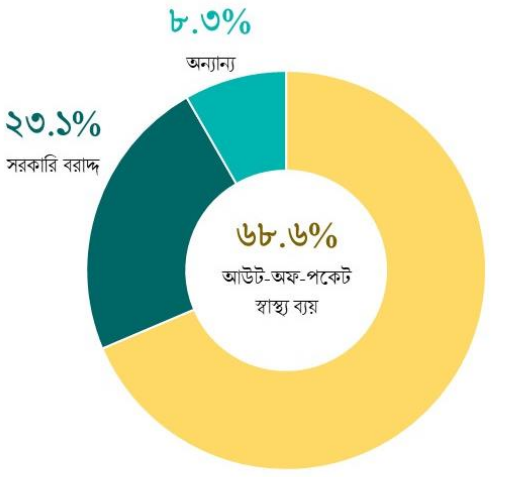

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০

সঙ্কটকালে বাজেট বরাদ্দে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতগুলোতে কাটছাটের প্রভাব বেশি পড়ে। প্রস্তাবিত বাজেটে এমন কাটছাট নজরে না এলেও মনে হচ্ছে **গতানুগতিকতার বাইরে যাওয়ার চেষ্টাও করা হয়নি।** মোট বাজেট ১৫ শতাংশের বেশি বাড়ানো হলেও শিক্ষা বাজেট আগের বছরের চেয়ে মাত্র ৮.২৪ শতাংশ বেড়েছে। শিক্ষা বাজেট ৮৮ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা মোট বাজেটের ১১.৫৭ শতাংশ (চলতি বছরে ১২ শতাংশের বেশি ছিল)। জিডিপির শতাংশ হিসেবেও শিক্ষা বাজেট ছোট হয়ে এসেছে। চলতি বছরে ১.৮৩ শতাংশ থেকে কমে

আসন্ন বছরে ১.৭৬ শতাংশ। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে জিডিপির শতাংশ হিসেবে শিক্ষায় বরাদ্দের বিচারে আমরা দক্ষিণ এশিয়ার গড়ের তুলনায় পিছিয়ে আছি (দক্ষিণ এশিয়ার গড় ২.৮৫ শতাংশ, বাংলাদেশের গড় ১.৯৭ শতাংশ)।

প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য বাজেট ৩৮ হাজার কোটি টাকার বেশি, যা মোট বাজেটের ৫ শতাংশ। এক দশক ধরেই এই অনুপাত অপরিবর্তিত আছে। বরাদ্দের গতানুগতিকতার কারণে আউট-অফ-পকেট স্বাস্থ্য ব্যয় কমানো সম্ভব হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে আমাদের মোট **স্বাস্থ্য ব্যয়ের মাত্র ২৩ শতাংশ আসে সরকারের বরাদ্দ থেকে।** আর ৬৮ শতাংশই বহন করতে হয় নাগরিকদের। তাই বাজেটে স্বাস্থ্যের অংশ বাড়ানো গেলে নাগরিকদের ওপর চাপ কিছুটা কমতো। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়নের অদক্ষতার কারণেই হয়তো স্বাস্থ্যের অংশটি বাড়ানো যাচ্ছে না। সর্বশেষ ২০২১-২২-এ স্বাস্থ্য বরাদ্দের ২৪ শতাংশই বাস্তবায়ন করা যায়নি। তবে এই মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্যও খানিকটা বরাদ্দ বাড়ানো যেতো।

কিছু নীতি-পরামর্শ

প্রথমত, সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও **বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক খাতগুলোর অংশ বাড়াতে বিভিন্ন খাতের বাজেট বরাদ্দ পুনর্বণ্টনের বিষয়টি ভেবে দেখা যায়।** সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ, এবং জনপ্রশাসন- এই তিন খাতে দেয়া বরাদ্দ এবং ঐ বরাদ্দের যতোটুকু শেষ পর্যন্ত অবাস্তবায়িত থেকে গেছে তার ভিত্তিতে উন্নয়ন সমন্বয়ের প্রক্ষেপণ থেকে দেখা গেছে আসছে অর্থবছরে এই তিন খাতের বরাদ্দ থেকে যে পরিমাণ অব্যয়িত থাকতে পারে তা মোট বাজেটের ১০ শতাংশের বেশি। কাজেই এ খাতগুলো থেকে ওই পরিমাণ বরাদ্দ সরিয়ে তা সামাজিক খাতে দেয়া গেলে মোট বাজেটের আকার না বাড়িয়েও সামাজিক খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়ানোর কথা বিবেচনা করা উচিৎ। সামাজিক ন্যায় বিচারের স্বার্থেই এটা করা উচিৎ।

দ্বিতীয়ত, **উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থায়িত প্রকল্পের সংখ্যা যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের পর কমিয়ে আনা সম্ভব** বলে ধারণা করা যায়। প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার প্রায় সমান। তাই বলা যায়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে ঋণের টাকায়। এ অবস্থায় যে প্রকল্পগুলো তুলনামূলক কম জরুরি সেগুলোর বাস্তবায়ন আপাতত স্থগিত করার কথা ভাবা উচিৎ। মনে রাখা চাই, শেষ পর্যন্ত সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বিপুল সংখ্যক প্রকল্পের বার্ষিক বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা আংশিক অর্জন করার চেয়ে- কিছু প্রকল্পে আদৌ অর্থায়ন না করে তুলনামূলক জরুরি প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি পূরণ করা গেলে সেটা বেশি মঙ্গলজনক হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন খাতের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার বিচারের কাজটি করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া যায়। তাছাড়া বাড়ন্ত মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে পরিচালন বাজেটকেও সযত্নে সঙ্কোচন করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয়।

তৃতীয়ত, **মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, আমদানি নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগকে গতিশীল রাখার মতো বিষয়গুলোতে বাজেট ও মুদ্রানীতির মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতেই হবে।** এই সমন্বয় নিশ্চিত করার মাধ্যমেই কেবল বিদ্যমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা সম্ভব। যেমন: বিদ্যমান বাস্তবতায় টাকা-ডলার বিনিময় হার বছর খানেক আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ মুদ্রানীতিতে নেই বললেই চলে। এ অবস্থায় আমদানি ব্যয় হ্রাসের জন্য জরুরি পণ্যগুলোর আমদানি শুল্ক যদি বাজেটে আরও কমানো যেতো তাতে মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে নাগরিকদের বেশ খানিকটা স্বস্তি দেয়া যেতো। একইভাবে মুদ্রানীতিতে বেঁধে দেয়া সুদের হারের পরিবর্তে সুদ হারের করিডোর ব্যবস্থা তথা বাজার-ভিত্তিক সমাধান প্রবর্তন এবং একক মুদ্রা বিনিময় হার প্রবর্তনের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন করা অনেকটাই সম্ভব। আর তাতে বাজেটের সামষ্টিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলো অর্জন সহজতর হবে। অচিরেই জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়কালের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ঐ মুদ্রানীতিতে এই প্রস্তাবনাগুলো প্রতিফলিত হওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা আশাবাদি।

সবশেষে বলা যায়, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনও এবারের বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ। আর রাজস্ব আহরণের এই চ্যালেঞ্জিং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এনবিআর-এর ব্যাপকভিত্তিক ডিজিটাইজেশনের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে বিগত ১৪-১৫ বছর ধরে দেশের আর্থিক সেবা খাতে ডিজিটাইজেশনের যে জোয়ার চলছে সে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশের ধারাকে আরও গতিময় করার জন্য এনবিআরের এই সংস্কার অপরিহার্য। অনলাইন ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিসের প্রসারের পর আর্থিক সেবা খাত প্রবেশ করেছে

Interoperable Digital Transaction Platform, IDTP (বিনিময়)- এর যুগে। এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে 'কিউআর কোড'-ভিত্তিক লেনদেন নিয়ে। বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা কিউআর কোড এরই মধ্যে চালু করেছে। এর ব্যাপক প্রসার কাম্য। আর্থিক সেবা খাতের এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগের আদলে এনবিআর যদি রাজস্ব আহরণ সহজীকরণের পথে হাঁটে তবে রাজস্ব আদায়ে গতি নিশ্চয়ই আসবে। তাই **রাজস্বের বড় লক্ষ্য বাস্তবায়নে এনবিআর এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে গভীরতর সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য**।

শেষের কথা

আপতকালিন বাস্তবতার নিরিখে আসছে অর্থবছরের জন্য সরকারি আয়-ব্যয়ের একটি চ্যালেঞ্জিং পরিকল্পনা হিসেবেই প্রস্তাবিত বাজেটকে দেখতে হবে। একই সঙ্গে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অর্জনগুলো যে শক্তি যোগাবে সেটিও মনে রাখতে হবে। দেশের অর্থনীতির মূল শক্তির যে তিনটি জায়গা- সেই কৃষি, রপ্তানি, ও রেমিটেন্সে যে বৈপ্লবিক অগ্রগতি বিগত দেড় দশকে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তা সত্যিই অনন্য। ২০০৬ থেকে ২০২৩ সময়কালে কৃষি উৎপাদন ২৬ মিলিয়ন টন থেকে প্রায় ৪ গুন বেড়ে ৯১ মিলিয়ন টন হয়েছে। একই সময়ের ব্যবধানে বার্ষিক রপ্তানি ৫ গুন ও রেমিটেন্স ৬ গুন বেড়ে যথাক্রমে ৫২.৯৭ বিলিয়ন ডলার ও ২৪.০৩ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। এতে করে মাথাপিছু আয় ৫৪৩ ডলার থেকে বেড়ে ২,৮০০ ডলার ছাড়িয়েছে। আয়বৃদ্ধির ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে দারিদ্র্য নিরসনের ওপর। উল্লিখিত সময়ের ব্যবধানে দারিদ্র্যের হার ৪২ শতাংশ থেকে ১৮.৭ শতাংশে এবং অতিদারিদ্র্য হার ২৫ শতাংশ থেকে ৫.৬ শতাংশে নামিয়ে আনা গেছে। অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় যারা প্রান্তে রয়ে গেছেন সেই নাগরিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার পরিধিও সমান তালে বেড়েছে। ২০০৬ সালে যেখানে বছরে ২১ লক্ষ নাগরিক সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় ছিলেন, ২০২৩-এ সেই সংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় ১৪ বছর যে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতির সুবাদে অর্থনৈতিক ও মানবিক উন্নয়ন সূচকগুলোতে এমন সব নাটকীয় অর্জন সম্ভব হয়েছে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা গেলে চলমান সঙ্কটও অতিক্রম করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়।

বাজেট তো নিছক অ্যাকাউন্টিং নয়। বরং একটি মনস্তাত্ত্বিক দলিল হিসেবে বিপদসঙ্কুল সময়ে জনমনে আস্থা তৈরিই বাজেটের মূল লক্ষ্য। সে বিচারে এ বাজেটের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা, এবং সর্বোপরি সামষ্টিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা থেকে নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দিতে যে প্রস্তাবনা/পরিকল্পনাগুলো হাজির করা হয়েছে এগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে এ বাজেট জনমনে বেশ খানিকটা ভরসা সঞ্চার করতে সচেষ্ট হয়েছে- এমনটি বলাই যায়। তবে এক বছরের বাজেট দিয়েই সব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব এমন ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে। পরিবর্তন ধীরে ধীরেই আসে। আগের বাজেটগুলোর ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই এবারের বাজেট সেই পরিবর্তনের ধারাকে কতোটা সহায়তা করছে সেটিই বিবেচ্য।

উন্নয়ন সমন্বয়

Bank Asia

আইনপ্রণেতা, নীতি-নির্ধারকসহ জাতীয় বাজেট বিষয়ে জানতে আগ্রহী সকল অংশীজনের কাছে বাজেট বিষয়ক তথ্য পৌঁছে দিতে উন্নয়ন সমন্বয়ের 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্প ডেস্ক' কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকাশিত। ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড এ উদ্যোগে সদয় সহযোগিতা দিচ্ছে।

বাজেট ২০২৩-২৪ নিয়ে আরও বিশ্লেষণী প্রকাশনার জন্য আমাদের সংসদ
ওয়েব প্ল্যাটফর্মে যেতে ডান পাশের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।